ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা
[Preamble to the Indian Constitution]

অধ্যায়সূচি

|| ১ ভূমিকা ২ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ||

৪.১. ভূমিকা (Introduction)

লিখিত সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনার সংযোজন এখন একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের লিখিত সংবিধানে এই নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম মার্কিন সংবিধানেই একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত হয়। তারপর জাপান, আয়ারল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের সংবিধানের শুরুতে একটি করে প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়।

সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন; একটি ঐতিহাসিক দলিল। প্রস্তাবনা হল এই সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ। গ্রন্থের ভূমিকার মতই হল সংবিধানের প্রস্তাবনা। ভূমিকার মাধ্যমে পাঠক সংক্ষেপে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়। গ্রন্থকার ভূমিকার মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থের উৎস, উদ্দেশ্য ও রচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেন। এই ভূমিকা কিন্তু গ্রন্থের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। একই কথা সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সংবিধানের ভূমিকা

প্রত্যেক দেশের সংবিধানের একটি মতাদর্শগত ভিত্তি থাকে। নির্দিষ্ট কতকগুলি আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে সংবিধান গড়ে উঠে। সুস্পষ্ট কিছু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে সংবিধানের সম্পূর্ণ কাঠামোটি তৈরি হয়। একে বলে সংবিধানের দর্শন বা দার্শনিক ভিত্তি। সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যেই তার দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় বর্তমান থাকে। প্রস্তাবনা সংবিধানের অন্তরাত্মা। সংবিধানের কার্যকরী অংশে প্রবেশের এ হল এক চাবিকাঠি। এর দ্বারা সংবিধান রচয়িতাদের ইচ্ছা, সংবিধানের উৎস এবং আইনগত ও নৈতিক ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রস্তাবনা থেকে সংবিধানের আদর্শগত ভিত্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অনুমোদনের প্রকৃতি জানা যায় এবং সরকারী কাঠামোর ধরন-ধারণ, সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। অর্থাৎ প্রস্তাবনা হল সংবিধানের নির্যাস স্বরূপ। কোন একটি আইন পাঠের জন্য দরকারী তথ্য সরবরাহ করাই হল প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য। বিচারপতি স্টোরি (Justice Story)-র মতানুসারে, প্রস্তাবনা সংবিধানের সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতির উল্লেখ করে এবং কোন্ কোন্ অসুবিধা ও অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সংবিধানটি রচিত হল তার বর্ণনা দেয় ("The preamble of a statute is a key to open the mind of the makers, as to the mischiefs which are to be remedied and the objects which are to be accomplished by the provisions of the statute.")।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব

প্রস্তাবনা কিন্তু সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। সংবিধানের মূল অংশের আগেই প্রস্তাবনাকে সংযুক্ত করা হয়। এই কারণে প্রস্তাবনার আইনগত গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। সংবিধানের মূল অংশই আইনানুসারে স্বীকৃত এবং বলবৎযোগ্য। আইনগত বিচারে প্রস্তাবনা গুরুত্বহীন। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বেরুবাড়ী সম্পর্কিত আলোচনায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে সংবিধানের অংশ হিসাবে প্রস্তাবনা গণ্য হতে পারে না। প্রস্তাবনাকে সরকার ও তার বিভাগসমূহের মূল ক্ষমতার উৎস হিসাবেও বিবেচনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে শ্রীদুর্গাদাস বসু বলেছেন : "The Preamble shows the general purpose behind the several provisions of the constitution, but nevertheless, it is not a part of the consitution and is never regarded as source of any sbustantive power."

আইনগত গুরুত্ব নেই

১৯৫০ সালে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট **Jacobson Vs Massachussets, 1950** মামলায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে যে, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে জনগণের সাধারণ লক্ষ্য প্রস্তাবনার মাধ্যমে

প্রকাশ পায়। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রস্তাবনাকে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস বলা যায় না। সংবিধানের কোন মূল অংশের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে প্রস্তাবনার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের কার্যকরী অংশের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা অসামঞ্জস্য থাকলে তা সংবিধানের মৌল নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রস্তাবনার মধ্যেই সংবিধানের মৌল নীতি নিহিত থাকে। তাই সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মূল বা কার্যকরী অংশের অর্থ সুস্পষ্ট হলে প্রস্তাবনা তার কোন পরিবর্তন করতে পারে না। **Powell Vs Kempton Park Race Course Co.** মামলায় হেলসবেরী (Lord Hailsbury)-র অভিমত অনুসারে প্রস্তাবনা আইনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রয়োজনমত আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু আইনের অর্থ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হলে প্রস্তাবনা সে ক্ষেত্রে আইনকে সঙ্কুচিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও কার্যকরী অংশের মধ্যে বিরোধ বাধলে কার্যকরী অংশই বলবৎ হয়।

সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়

৪.২. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব (Importance of the preamble to the Indian Constitution)

ভারতের সংবিধানের শুরুতেও একটি প্রস্তাবনা যুক্ত হয়েছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা মুখবন্ধের দায়িত্বই পালন করেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে প্রস্তাবনায়। গণপরিষদে নেহরু সংবিধানের উদ্দেশ্যসমূহ সংক্রান্ত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন প্রস্তাবনায় সেই প্রস্তাবের আদর্শগুলিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। **গোলকনাথ মামলায়** রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতি সুব্বারাও বলেছেন যে, প্রস্তাবনা সংক্ষেপে সংবিধানের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছে। এই প্রস্তাবনার নৈতিক প্রভাব অপরিসীম। সংবিধানের উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আদর্শগত ভিত্তি প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের কাছে প্রস্তাবনা একটি পথনির্দেশিকা স্বরূপ।

মূলতঃ তিনটি কারণে ভারতীয় সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত হয়েছে। (১) সংবিধানের উৎস, আইনগত ভিত্তি ও নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রস্তাবনা ইঙ্গিত দেয়। (২) প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য, নীতিসমূহ ও সংবিধান গ্রহণের তারিখ উল্লিখিত আছে। (৩) প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অস্পষ্ট শব্দ বা বাক্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে [**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী (১৯৫২)**]। (৪) **ভারতী চন্দ্র ভবন বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৭০)** মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির পরিধি সম্পর্কে অধিকতর বিশদভাবে অবহিত হওয়া যায়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বিবিধ উপযোগিতা

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য হল এই যে, এখানে সর্বকালের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকে সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সংবিধানের কার্যকরী অংশের এমন সুন্দর ভূমিকা খুব কমই দেখা যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বার্কার (Ernest Barker) এই প্রস্তাবনাকে "Testament of his old age" বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক বার্কার তাঁর *Principles of Social and Political Theory* শীর্ষক বিশিষ্ট গ্রন্থের গোড়াতেই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে উল্লেখ করেছেন। এই প্রস্তাবটির প্রশংসা করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বলেছেন : "I am proud that the people of India should begin their independent life by subscribing to the principles of a political tradition which we in the west call Western but which is now something more than Western." সংবিধান-বিশেষজ্ঞ কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : ".....Sir Ernest Barker was so moved by the text that he quoted it as a preface to his treatise and thought that it represented the quintessence of his work. He said : 'It seemed to me, when I read it, to state in a brief and pithy form the argument of much of the book; and it may accordingly serve as a keynote'." প্রস্তাবনাটি ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান অংশ। টি. ডি. ভার্গব (T. D. Bharghaba) বলেছেন : "The Preamble is the most precious part of the Constitution. It is the soul of the constitution. It is a key to the Constitution. It is a proper Yardstick with which one can measure the worth of the Constitution. " পণ্ডিত ভার্গব আরও বলেছেন : "It is a jewel set in the Constitution." It is a superb prose-poem, nay it is perfection in itself." ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হিদায়েতুল্লা (M. Hidayatuallah) এ

বিশেষজ্ঞদের অভিমত

প্রসঙ্গে বলেছেন : "Preamble resembles the Declaration of Independence of the United States of America, but is more than a declaration. It is the soul of our Constitution which lays down the pattern of our political society which it states is Sovereign Democratic Republic. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter." সুব্বারাও (G. C. Venkata Subba Rao) বলেছেন : "The spirit or the ideology behind the Constitution is sufficiently crystalised in the preamble."

ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন মামলায় রায় দিতে গিয়ে বিচারপতিরা প্রস্তাবনার তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন। বেরুবাড়ী মামলায় সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অনুযায়ী প্রস্তাবনা হল সংবিধান রচয়িতাদের মনোরাজ্যের চাবিকাঠি। সংবিধানের কোন বিশেষ অর্থ অস্পষ্টতার কারণে বোধগম্য না হলে, প্রস্তাবনার সাহায্যে সংবিধানকাররা কি বোঝাতে চেয়েছেন তা অনুধাবন করা যায়। কোন একটি বিশেষ শব্দ সংকীর্ণ নাকি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সম্যকভাবে বোঝা যায়।

বিচারপতি হিদায়েতুল্লা

বিচারপতি হিদায়েতুল্লা **গোলকনাথ বনাম পঞ্জাব রাজ্য সরকার** মামলায় ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতানুসারে সরকার কোন্ নীতি অনুসারে কার্যাবলী সম্পাদন করবে সংবিধানের প্রস্তাবনায় তা বলা আছে। প্রস্তাবনা হল সংবিধানের সহায়ক। সংবিধান রচয়িতাদের অভিপ্রায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে প্রস্তাবনার মাধ্যমে। প্রস্তাবনা সংবিধানের প্রাণস্বরূপ। এই প্রস্তাবনা অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। বিচারপতি হিদায়েতুল্লার অভিমত অনুযায়ী প্রস্তাবনা বলতে জাতীয় জীবনের মৌলিক কিছু বিষয়ে আমাদের মতামত ও বিশ্বাসকে বোঝায়। প্রস্তাবনায় যে মানদণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায় তার থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত।

বিচারপতি রামস্বামী

বিচারপতি রামস্বামী **এস. আর. বোম্বাই মামলায়** ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর মতানুসারে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল প্রস্তাবনা। সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনী আলোচনা এবং দেশের ঐক্য ও সংহতি।

কেশবানন্দ ভারতী মামলা

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য সরকার মামলায়ও সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বলেছেন। এই মামলার রায় দান প্রসঙ্গে অধিকাংশ বিচারপতি গণ-পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনা ও বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রস্তাবনা হল সংবিধানের অঙ্গ বিশেষ। প্রস্তাবনা সংবিধানের অঙ্গমাত্রই নয়; প্রস্তাবনা হল সংবিধানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রস্তাবনার দৃষ্টিভঙ্গী মহৎ। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সংবিধান ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। বিচারপতি সিক্রির মতানুসারে সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব তার আইনগত ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে।

বিচারপতি মাধোলকর

বিচারপতি মাধোলকর **সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য সরকার** মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সংবিধান রচয়িতারা প্রস্তাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রস্তাবনা হল বিশেষভাবে বিবেচনাপ্রসূত এবং অগ্রগতির সূচক।

এই প্রস্তাবনা সংবিধানের অস্পষ্ট অংশ ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। কিন্তু স্পষ্ট অংশের অর্থকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করতে পারে না (**কুনি বনাম কেরল রাজ্য**)। সংবিধানের কার্যকরী অংশের আইনগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। সংবিধানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা করতে হবে মূলতঃ কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের ভিত্তিতে; প্রস্তাবনার ভিত্তিতে নয় (**গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য**)। বস্তুতঃ আইনগত বিচারে প্রস্তাবনার বিশেষ কোন মূল্য নেই। সংবিধানের কার্যকরী অংশের আইনগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার ভূমিকা খুবই সীমিত। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন-এর মতে এই প্রস্তাবনা হল 'নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প' (Solemn resolve)। কিন্তু সংকল্প ও কার্যকরী আইন এক নয়। সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ হিসাবেই গণ্য করা হয়। তবে প্রস্তাবনায় ঘোষিত নীতি ও আদর্শসমূহ পুরোপুরি কার্যকর করা এখনও সম্ভব হয়নি।

আইনগত গুরুত্ব সীমিত

বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকরের অভিমত অনুযায়ী প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। প্রস্তাবনা সূত্রে আইনসভা বা রাষ্ট্রের অন্য কোন সংস্থা বিশেষ কোন ক্ষমতা পায়নি। এ প্রসঙ্গে সংবিধান-বিশেষজ্ঞ কাশ্যপ (S. C. Kashyap)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে বর্তমানে প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অঙ্গ বলেই বিবেচনা করা হয়। এ কথা ঠিক। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রস্তাবনা কোনও ক্ষমতার উৎস হিসাবে পরিগণিত হতে

পারে না। অনুরূপভাবে আবার প্রস্তাবনা কোন ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতাও আরোপ করতে পারে না। কাশাপ তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "But, even though the Preamble is now taken to be an inviolable part of the Constitution, it also remains a fact that it is neither a source of any power nor a limitation there on. First asserted in the *Berubari* case, this point was reiterated by justice Mathew in Indira Nehru Gandhi V. Raj Narain (1975)."

৪.৩. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to the Constitution of India)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে : "আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক , ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা; মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে উঠে, তার জন্য আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি। "

("**WE THE PEOPLE OF INDIA,** having solemnly resolved to constitute India into a **Sovereign Socialist Secular Democratic Republic** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ;

EQUALITY of status and of opportunity ;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby **ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**"

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তার তাৎপর্য

সংবিধানের ভূমিকা বা চাবিকাঠি	প্রস্তাবনা
রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি	"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিকদের জন্য
রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার; চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা; মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে উঠে, তার জন্য
সংবিধানের উৎস ও সংবিধান গ্রহণের তারিখ	আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে (১৯৪৬) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৩ই ডিসেম্বর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সম্বলিত এক প্রস্তাব (Objective Resolution) উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে সংবিধানের উদ্দেশ্য ও দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। প্রস্তাবগুলি ২২শে ডিসেম্বর অনুমোদিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রণীত হয়েছে। মূল

সংবিধানের প্রস্তাবনাটির সঙ্গে কিছু সংযোজন ঘটেছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার গোড়ার দিকে 'সমাজতন্ত্র' (Socialist) ও ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) এবং শেষের দিকে 'সংহতি' (Integrity) শব্দগুলি সংযুক্ত হয়েছে। এই শব্দগুলি মূল প্রস্তাবনায় ছিল না।

বক্তব্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে দু'টি মূল অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রস্তাবনার প্রথম অংশে সংবিধানের উৎস এবং দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে।

(ক) **আমরা ভারতের জনগণ (WE, THE PEOPLE OF INDIA)** প্রস্তাবনার শুরুতেই "আমরা ভারতের জনগণ" শব্দগুলো সংযুক্ত হয়েছে। প্রস্তাবনাটি শুরু হয়েছে "আমরা ভারতের জনগণ" বলে এবং শেষ হয়েছে এই বলে "আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।" এর মাধ্যমে সংবিধানের উৎস ও অনুমোদন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবনায় গণ-সার্বভৌমিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় জনগণই হল সংবিধানের উৎস ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাই হল সংবিধানের আইনগত ভিত্তি। তাই এই সংবিধান মানতে প্রত্যেকে বাধ্য। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেছে (**ভারত সরকার বনাম মদনগোপাল, ১৯৫৪**)। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অনুসারে বলা হয়, প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের সংবিধান জনগণের কাছে কর্তৃত্ব পেয়েছে। আবার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈতিক দিক থেকেও জনগণ সংবিধানকে মেনে নিতে বাধ্য। জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত সংবিধানকে মান্য করতে জনগণ নীতিগতভাবে বাধ্য। সংবিধান হল দেশের মৌলিক বা চরম আইন (Fundamental or Supreme Law)। একে অমান্য করলে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। গণপরিষদে ড. আম্বেদকর (B. R. Ambedkar) মন্তব্য করছেন : "This Constitution has its roots in the people and it derives its authority from the people." অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) বলেছেন : "...in the moral sphere it is sometimes argued that a constitution commands obligation because it expresses the will of the people."

বিশেষজ্ঞদের মতামত :

কে. ভি. রাও (K. V. Rao) তাঁর *Parliamentary Democracy in India* গ্রন্থে প্রস্তাবনায় 'আমরা ভারতের জনগণ' কথাগুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে এই কথাগুলির দ্বারা বোঝান হয়েছে যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে ভারতে ব্রিটিশ রাজ ও দেশীয় নৃপতিদের সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘটেছে। ভারতের সংবিধানের মূল রচয়িতা হল দেশের জনসাধারণ। তাদের প্রতিনিধিরাই গণপরিষদে দেশের সর্বোচ্চ আইন বিধিবদ্ধ ও গ্রহণ করেছে।

কামাথ গণপরিষদে এই দাবি করেছেন যে ভারতীয় জনগণের পক্ষে ও নামে তাঁরা গণপরিষদে ভারতের সংবিধান প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যরা হলেন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি। তাঁদের পরিচিতি ব্যক্তি বিশেষ হিসাবে নয়।

খসড়া-কমিটির সভাপতি ড. আম্বেদকরও গণপরিষদে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের জনগণই হল সংবিধানের উৎস। জনগণের হাতেই এর সার্বভৌমিকতা ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত আছে।

সংবিধান বিশারদ **সুভাষ সি. কাশ্যপের** মতানুসারে 'ভারতের জনগণ এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ ও নিজেদের অর্পণ করেছে' এ কথা বলার মাধ্যমে সংবিধান-রচয়িতারা 'এক জাতি, একটি সংবিধান ও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা' এই ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের জনগণ কোন রাজ্যের নয়। সার্বভৌমত্ব হল সমগ্র দেশের জনগণের, কোন বিশেষ রাজ্যের নয়। সংবিধান কোন বিশেষ রাজ্যের জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়নি। সংবিধান প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে সমগ্র দেশের মানুষের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে। সংবিধানের মূল প্রেরণা শক্তি হল ভারতের জনগণ। ভারতীয় রাজনীতিতে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত আছে জনগণের উপরই। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা হল গণতান্ত্রিক। এখানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত। ভারতে জাতির ঐক্য সুনিশ্চিত। কাশ্যপ বলেছেন : "Thus, the preamble serves the purpose of declaring that 'The people of India' are the source of the Constitution, that sovereignty in Indian polity vesto in the people and that Indian polity is democratic with Fundamental Rights and freedoms guaranteed to the people and unity of the nation assured."

ভারতীয় সংবিধানের এই গণভিত্তিক চরিত্র ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে (**এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য, ১৯৫০**)। এই মামলায় বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর মতানুসারে, প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণই হল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অধ্যাপক হোয়ার বলেছেন : "The Supremacy of the Indian Constitution .....arises from the fact that it claims to be the work of the people."

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই গণ-সার্বভৌমিকতার ধারণাটি মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি প্রণীত হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনাও "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ" (We, the people of United States") কথাগুলি দিয়ে শুরু হয়েছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মার্শাল (Marshall) ম্যাক্‌লুচ বনাম মেরীল্যাণ্ড মামলায় বলেছেন যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থা হল জনগণের দান; জনগণই হল এই সংবিধানের উৎস। তাঁর কথায় : "The government proceeds directly from the people—it is ordained and established in the name of the people. In form and substance it emanates from the people."

মার্কিন অনুকরণ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'আমরা ভারতের জনগণ' কথাগুলির ব্যবহার বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। সমালোচকরা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

(১) সমালোচকদের মতানুসারে পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানই জনগণের দ্বারা রচিত হয়নি বা হতে পারে না। অধ্যাপক বিয়ার্ড (Dr. Charles A. Beard) তাঁর *An Economic Interpretation of the Constitution* (USA) গ্রন্থে বলেছেন যে, সংবিধানের উৎস হিসাবে জনগণের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে রচয়িতাদের ধ্যান-ধারণাই সংবিধানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এ কথা ভারতের সংবিধান সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

(২) ভারতীয় গণপরিষদকে ভারতীয়দের প্রকৃত প্রতিনিধি বলা যায় না। কারণ এই গণপরিষদের কোন গণভিত্তি ছিল না। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে গণ-পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হননি। সেই সময় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষের ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল। তার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যরা। ঐ সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরাই গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছিলেন। অর্থাৎ গণপরিষদ গঠনে ভারতের ৮৬ শতাংশ মানুষের কোন ভূমিকা ছিল না। অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) -এর অভিমত হল গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল ভারতের জনগণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে। তিনি বলেছেন : "In India **the people** enacted the constitution **in our Constituent Assembly,** but that assembly was composed of representatives not elected by a majority of the people of India and the Constitution itself was never submitted to the people directly. Is it not unreal in any case to speak of **the People** enacting a constitution in or through a constituent Assembly ? "

(৩) সংবিধানটি চূড়ান্তভাবে প্রণীত হওয়ার পর জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য তা গণভোটে পেশ করা যেত। আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানকে গণভোটে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের সংবিধানকে গণভোটে পেশ করা হয়নি। সংবিধান রচনার প্রাক্কালে কোন স্তরেই ব্যাপকভাবে জনগণের মতামত প্রকাশের কোন রকম সুযোগ ছিল না। কে. ভি. রাও (K. V. Rao)-এর মতানুসারে ভারতীয় সংবিধানকে জনগণের উপর কংগ্রেস চাপিয়ে দিয়েছে।

(৪) গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল না। গণপরিষদে দেশীয় নৃপতিদের মনোনীত প্রতিনিধিরা ছিলেন। তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত সদস্যরাও ছিলেন। অর্থাৎ গণপরিষদে সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধিরা ছিলেন।

(৫) ভারতীয় সংবিধানের আইনগত ভিত্তি বলতে ভারতের জনগণকে বোঝায় না। এই ভিত্তি হল '১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (Indian Independence Act, 1947)। জেনিংস ও ইয়ং (Jennings & Young) তাঁদের *Constitutional Laws of the Commonwealth* গ্রন্থে বলেছেন : "...the constitution of 1949...derives validity from the Indian Independence Act. 1947 ." সুতরাং এক অর্থে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনই হল ভারতের গণপরিষদ ও সংবিধানের উৎস। জি. এন. যোশী (G. N. Joshi) বলেছেন : "In one sense the source of authority of the Indian Constitution is the Act of the British Parliament." ড. সেন (Dr. D. N. Sen) তাঁর *From Raj to Swaraj* গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, গণপরিষদ ব্রিটিশ আইনের দ্বারা গঠিত হয়েছে। তাকে ভারতের জনগণ বলে দাবি করা যায় না। ("...a Constitutent Assembly set up by the British and under a British law could not claim that it was the people of India) |

(৬) কে. ভি. রাও (K. V. Rao) -এর মতানুসারে ভারতের সংবিধান হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, ভারতের জনগণের নয় । তিনি বলেছেন : "It was not 'We' the people of India.....that

made the constitution, it was the top layer of the Indian society, it was the educated middle class that made it.''

উপরিউক্ত সমালোচনার জবাব হিসাবেও বিভিন্ন যুক্তি দেখান হয়।

(১) ব্রিটিশ সরকার যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্থির। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অস্থির ও জটিল হয়। সেই সময় গণপরিষদ গঠনের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা কার্যতঃ সম্ভব ছিল না। সমকালীন সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কে. ভি. রাও (K. V. Rao) যথার্থই বলেছেন : ''It is as much democratically made as circumstances permitted it...''

(২) গণভোটের দাবি সম্পর্কিত সমালোচনাও সঠিক নয়। সেই সময় গণভোটের ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ব্যাপার হত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল প্রতিকূল। গণভোটের কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হল এক উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যকর অভিজ্ঞতা। সদ্য স্বাধীন ভারতে তেমন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কাঠামো তখনও গড়ে উঠেনি। তাই ভারতের সংবিধানকে গণভোটে পেশ করা যায়নি।

(৩) প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না হলেও গণপরিষদের সদস্যগণ জনগণের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একথা প্রমাণিত হয়েছে। সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। যাঁরা সংবিধান প্রণয়নে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন জনগণ তাঁদের পরাস্ত করে। এই কারণে দাবি করা হয় যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেও গণপরিষদের গঠন প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকত। অথচ নির্বাচনের জন্য যে বিলম্ব হত তাতে অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা ছিল। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় (D. N. Banerjee) বলেছেন : ''....a delay which might prove dangerous in many ways in these days.''

(৪) দাবি করা হয় যে জনগণ পরবর্তী কালে সংবিধানকে স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল ও মানুষ এই সংবিধানকে অনুমোদন করেছে। সংবিধানে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে ১৯৫২ সাল থেকে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে। সকল দল ও জনসাধারণ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েছে। অর্থাৎ ভারতের সংবিধান জনগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। যোশী (G. N. Joshi) বলেছেন : ''Thus the real source and sanction of the Indian Constitution is the people of India.''

(৫) জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংবিধানের কোন আমূল পরিবর্তন করেননি। অথচ সংবিধানের সকল অধ্যায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা ও অধিকার জনপ্রতিনিধিদের আছে। সুতরাং জনগণ যে সংবিধানটিকে গ্রহণ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৬) তা ছাড়া, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের দ্বারা গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল। একথা ঠিক। কিন্তু এর কার্যক্রম, কার্যপদ্ধতি ও রচিত সংবিধান সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন এক্তিয়ার ছিল না।

(৭) সর্বোপরি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভারতীয় গণপরিষদ আইনগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

(৮) অনেকের মতে প্রস্তাবনায় 'ভারতের জনগণ' কথাগুলির দ্বারা ভারতীয়দের একটা সামগ্রিক সত্তার কথা বলা হয়েছে। এর মূল অর্থ হল এই যে ভারতীয় সংবিধান কোন বিদেশী শক্তির সৃষ্টি নয়। কে. ভি. রাও (K. V. Rao) তাঁর *Parliamentary Democracy of India* গ্রন্থে বলেছেন : ''The significance of 'We, the People' lies in the fact that the Constitution eliminates the British King externally, and the Indian Princes internally, from claiming any vestiges of sovereignty.''

(খ) সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC)

প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রতিটি শব্দ নিয়ে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

সার্বভৌম কথাটির অর্থ হল ভারত আভ্যন্তরীণ এবং বহির্ব্যাপারে সকল রকম বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। এর দুটি দিক আছে : আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থ হল রাষ্ট্রের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে রাষ্ট্রের আইন হল চরম, চূড়ান্ত

ও অবাধ। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এর উর্ধ্বে বা বাইরে কেউ থাকতে পারে না। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলতে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতাকে বোঝায়। অধ্যাপক গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতী। যাইহোক ভারত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় অর্থেই পরিপূর্ণভাবে সার্বভৌম।

সার্বভৌম

ভারতের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রীয় আইন চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ভাবে কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত। স্বাধীনভাবে ভারত সরকার তার পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। অধ্যাপক জোহারীর মতানুসারে ভারত যে প্রকৃতই সার্বভৌম তার বড় প্রমাণ হল ভারতের সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা রচিত হয়েছে। অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) বলেছেন : "The very fact that the Constitution of India has been made by 'We, the People of India' lays down the doctrine of the ultimate sovereignty of the people of this country." ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির মত কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষ এই সংবিধান প্রণয়ন বা প্রয়োগ করেনি।

সমালোচকদের কারও কারও মতে কমনওয়েলথের (Commonwealth) সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কারণ কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীকে মেনে নিতে এই সংস্থার সদস্যরা বাধ্য। এতে সার্বভৌম মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কমনওয়েলথের সদস্যপদ কোনভাবেই ভারতের সার্বভৌম চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করে না। এই সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌম প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ কমলওয়েলথ হল একটি স্বেচ্ছামূলক সংস্থা। স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারত সরকার এর সদস্য হয়েছে। ইচ্ছা করলেই ভারত এই সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। পাকিস্তান কমনওয়েলথের সদস্য ছিল। তারপর এক সময় পাকিস্তান এই সদস্যপদ ত্যাগ করে। আবার পাকিস্তান এই সংস্থার সদস্য হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান মোশারফ হোসেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানী হলেন কমনওয়েলথের প্রতীকী প্রধান (Symbolic Head)। ভারতের সংবিধানে ব্রিটিশ রাজশক্তির কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ভারতের উপর কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপের এক্তিয়ার কমনওয়েলথের নেই। ভারতও কমনওয়েলথের কোন সিদ্ধান্ত মেনে চলতে আইনত বাধ্য নয়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়া অথবা ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীকে এই সংস্থার প্রধান হিসাবে ঘোষণা করা প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সংবিধানের কোথাও কোন উল্লেখ নেই। সমগ্র বিষয়টি সংবিধানের বাইরে সম্পাদিত হয়েছে। এর কোন সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই। কমনওয়েলথের ব্যাপারে ভারত রাষ্ট্রের কোন সাংবিধানিক দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই। পালান্দে (M. R. Palande) এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "...an extra-constitutional contractual arrangement entered into at will and terminable at will." কমনওয়েলথের সদস্যপদ স্বেচ্ছায় যেমন গ্রহণ করা যায়, তেমনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা যায়। পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করেছেন : "It is an agreement by free will, to be terminated by free will."

কমনওয়েলথের সদস্যপদ সার্বভৌমিকতার বিরোধী নয়

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947) অনুসারে ভারত ডোমিনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভারতের কমনওয়েলথের সদস্যপদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গণপরিষদের উপর এসে পড়ে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৯৪৯ সালে। বলা হয় যে ভারত এই সংস্থার সদস্য থাকবে; তবে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানী এই সংস্থার প্রতীকী প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন। কিন্তু এ বিষয়টি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৫০ সালে ভারতকে সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের গণপরিষদ হল একটি সার্বভৌম সংস্থা। এর কাজকর্মে হস্তক্ষেপের এক্তিয়ার কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নেই। জেনিংস (Sir Ivor Jennings)-ও স্বীকার করেছেন যে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ছিল সার্বভৌম।

১৯৪৯ সালে ঘোষিত সিদ্ধান্তটি ছিল পুরোপুরি সংবিধান ও আইনের বাইরে গৃহীত একটি ব্যবস্থা। এর কোন আইনানুগ তাৎপর্য নেই। শ্রী দুর্গাদাস বসু (D. D. Basu) বলেছেন : "The declaration is extra-legal and there is no mention of it in the Constitution of India. It is a voluntary declaration and indicates a free association and no obligation ." যোশী (G. N. Joshi) মন্তব্য করেছেন : "The core of the agreement is that India, which have become a Republic continues to recognise the King as the unifying symbol of Commonwealth association and that she enjoys complete independence as a Republic." তা ছাড়া 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ'-এর 'ব্রিটিশ' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই ভারত এই সংগঠনের সদস্য আছে। সর্বোপরি

ভারতরাষ্ট্র তার কিছু অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের বিচারে কমনওয়েলথের সদস্যপদ বজায় রেখেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক স্বার্থের বিবেচনায় ভারত এখনও এই সংগঠনের সদস্যপদ বজায় রেখেছে। যোশী বলেছেন : '' India remains a member of the Commonwealth as it is in her interest and for her benefit that she should do so.'' জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে পণ্ডিত নেহরু বলেছেন : ''It must be remembered that the Commonwealth is not a super state in any sense of the term. We have agreed to consider the King as the symbolic head of this free association. So far the Constitution of India is concerned, the King has no place and it shall owe no allegiance to him.'' সুতরাং কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ এবং এই সংগঠনের প্রধান হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা-রানীকে স্বীকার ভারতের সার্বভৌমিকতার পরিপন্থী নয়। পণ্ডিত নেহরুর (Nehru) সুস্পষ্ট অভিমত হল : ''We took pledge long ago to achieve Purna Swaraj. We have achieved it. Does a nation lose its independence by an alliance with another country? '' পণ্ডিত নেহরু গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব (Objective Resolution) উত্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন : ''....it is our firm and solemn resolve to have an Independent Sovereign Republic. India is bound to be **sovereign,** it is bound to be **independent** and it is bound to be a **republic.''**

বিশেষজ্ঞের মতামত

সংবিধান-বিশেষজ্ঞ কাশ্যপ (S. C. Kashyap)-এর অভিমত অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের সনাতন ধারণা অনুযায়ী অধুনা কোন রাষ্ট্রকেই সর্বার্থে সার্বভৌম বলা যাবে না। কিছু কিছু বিষয় সার্বভৌমত্বের উপর বাধ্যবাধকতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং সার্বভৌমত্বকে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণও করে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, ইউরোপীয় আর্থনীতিক কমিটি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ; আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তি, সম্মেলন, সমঝোতা ইত্যাদি।

মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি ছিল না। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুসারে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কি ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে সংবিধানে কিছু বলা নেই। সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য অনুসারে উৎপাদনের উৎসগুলির সামাজিক মালিকানা এবং উৎপন্ন সামাজিক দ্রব্যসামগ্রীর সামাজিক মালিকানায় বণ্টন-ব্যবস্থাকে বোঝায়। মরিস কর্নফোর্থ (Maurice Cornforth) বলেছেন : ''Socialism is the social ownership of the means of production and their utilization to satisfy the material and cultural requirements of the whole society.'' ভারতে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়নি। এখানে সমাজতন্ত্র শব্দটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা দরকার। দারিদ্র্যমোচন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যেই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূল নিহিত আছে। গজেন্দ্রগাদকার (P. B. Gajendragadkar) বলেছেন : ''India is committed to the ideal of the welfare-state and must establish socio-economic justice.'' অবাধ ধনতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উন্নয়নের সঙ্গে ন্যায়বিচারকে সংযুক্ত করাই হল এর মূল উদ্দেশ্য। ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন জায়গায় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ আইনগত অধিকার হিসাবে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ৩০০(ক) ধারায় স্বীকৃত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পবাণিজ্য ভারতে বর্তমান। অর্থাৎ 'মিশ্র অর্থনীতি' (Mixed Economy) স্বীকার করা হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে কিছু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে। সর্দার স্মরণ সিং প্রমুখ-র মতে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের থেকে নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে ভারত সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তরিক সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছে। সংবিধান বিশারদ কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : ''The text of the Preamble as amended gives almost the highest place of honour to the objective of 'socialism'. It is mentioned next only to 'sovereign'. However, the term 'socialism' has not been defined by the Constitution.''

সমাজতান্ত্রিক

বিচারপতি পি. বি. মুখার্জী প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র কথাটির অন্তর্ভুক্তির সমালোচনা করেছেন। (১) 'সমাজতন্ত্র' মূলতঃ একটি রাজনৈতিক আদর্শ। ভারতের মত উদারনৈতিক দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এর অন্তর্ভুক্তি অনুচিত। (২) ভারতের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শ সংযুক্ত হয়নি। (৩) বাস্তবে যে আদর্শকে যথাযথভাবে কার্যকরী

সমালোচনা

করা একরকম অসম্ভব তাকে প্রস্তাবনার মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। (৪) প্রস্তাবনার 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট।

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে **'ধর্মনিরপেক্ষ'** শব্দটিও প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়েছে। এর অর্থ হল রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করবে না। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। ভারতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু নেই। ভারত রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মমতের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। এখানে ধর্মকে ব্যক্তির বিবেক ও বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। পানিক্কর (K. M. Panikkar) তাঁর *The Foundations of New India* গ্রন্থে বলেছেন যে ভারতে ধর্মের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত হতে দেওয়া হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষ

ভারতে বহু ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছেন। ধর্মীয় সম্প্রীতি ভারতের বরাবরের আদর্শ। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষতা সনাতন ভারতের প্রাচীন আদর্শ। ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে এবং ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তার আগেও এবং প্রকৃতপক্ষে বরাবরই ভারতে এ দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার যাবতীয় উপাদান বর্তমান ছিল। ভারতের জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনী আইনে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আদর্শ ভারতে যথেষ্ট সফল হয়েছে। দেশবাসীদের মধ্যে ১৪ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায় থেকে তিনবার ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ডঃ জাকির হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ এবং এ. পি. জে. আবদুল কালাম ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তেমনি আবার উপ-রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিদায়েতুল্লা। এই ঘটনার মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্য নিহিত আছে।

সংবিধান বিশারদ কাশ্যপ (S. C. Kashyap) এ বিষয়ে বলেছেন যে, ভারতের সংবিধানের ১৪-১৬, ১৯, ২৫-২৮, ৪৪ প্রভৃতি অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রায়োগিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকেই ধর্ম, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা বলা আছে। সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অঙ্গীকার আগে থেকেই প্রস্তাবনাতে ছিল। মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য এবং সকলের মধ্যে সৌভ্রাত্বের নীতির মাধ্যমে এই অঙ্গীকার সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রস্তাবনায় 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কি অর্থে 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থেই গণতন্ত্রকে প্রয়োগ করা যায়। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রকে বোঝায়। এ হল সরকার গঠন ও পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সংবিধানের ৩২৬ ধারায় গৃহীত হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি, আইনের অনুশাসন এবং স্বাধীন বিচার-বিভাগের মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতে জনপ্রতিনিধিদের হাতেই শাসনক্ষমতা ন্যস্ত আছে।

গণতান্ত্রিক

কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের অর্থ অধিকতর ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। বলা হয় যে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য । অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কি (H. Laski) বলেছেন : "Political equality is never real unless it is accompanied by virtual economic equality." বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *Nationalism* শীর্ষক রচনায় বলেছেন : "Democracy in the political sphere has really no meaning unless it is accompanied by democracy in the social, economic and the spiritual spheres." তিনি আরও বলেছেন সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর রাজনৈতিক সৌধ নির্মাণ অলস কল্পনা বই কিছু নয় ("It is an idle hope to think of building a political miracle of freedom upon the quicksand of social slavery.")।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র অর্থহীন

এই কারণে ভারতের সংবিধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ গৃহীত হয়েছে। দাবি করা হয় যে ব্যাপক অর্থেও গণতন্ত্রকে রূপায়ণের পরিকল্পনা ভারতের সংবিধানে করা হয়েছে। সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিষ্ঠাই হল ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র।

পণ্ডিত নেহরু বলেছেন : "If there is economic inequality in the country all the political democracy and all the adult suffrage in the world cannot bring about real democracy." ভারতের সংবিধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই ন্যায়-বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক স্থাপন করা হল সাম্য ও ন্যায়ের মূল কথা। ভারতের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতির ভিত্তিতে যে-কোন ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়েছে। বলা হয় যে ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। জওহরলাল নেহরু, ড. আম্বেদকর প্রমুখ ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। ড. আম্বেদকর (Dr. Ambedkar) বলেছেন : "We have established political democracy, it is a desire that we will lay down as our ideal economic democracy." সংবিধান-বিশেষজ্ঞ কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন যে ডঃ আম্বেদকর সামাজিক ও আর্থনীতিক গণতন্ত্রকেই মূল লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। আম্বেদকরের অভিমত অনুযায়ী আর্থনীতিক গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে না পারলে সংসদীয় গণতন্ত্র মূল্যহীন। পণ্ডিত নেহরুর মতানুসারে গণতন্ত্র হল একটা মাধ্যম। গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। লক্ষ্যটি হল কিছু প্রয়োজনীয় আর্থনীতিক চাহিদা পূরণ করা এবং সুস্থভাবে একটি ভদ্র জীবন যাপন করা। গণতন্ত্রের মাধ্যমে আর্থনীতিক সমস্যাদির সম্যক সমাধান সম্ভব হলে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সফল হবে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার এবং চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে একযোগে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় যে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের সমন্বয়ের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বলা হয় যে প্রস্তাবনায় ঘোষিত ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে অর্থবহ হয়ে উঠবে।

দাবি করা হয় যে ভারতে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্রকে প্রয়োগ করা হয়েছে

কিন্তু প্রকৃত বিচারে প্রস্তাবনায় পরিকল্পিত গণতন্ত্রের সামগ্রিক রূপটি ভারতে আজও রূপায়িত হয়নি। সংবিধানে স্বীকৃত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও এখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ও শোষণ-বঞ্চনা অব্যাহতভাবে বর্তমান। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটেনি। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ কার্যকর হতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ সাম্যের ভিত্তিতে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত না হলে পরিপূর্ণভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

মন্তব্য

প্রস্তাবনায় গণতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণতন্ত্র শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র সমার্থক বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান। গণতন্ত্রের মত সাধারণতন্ত্রেও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সরকার থাকে। অধিকন্তু সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হয় নির্বাচনমূলক। এখানে বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারমূলক কোন রাজপদ থাকে না। রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। সাধারণতন্ত্রে জনগণের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। সংবিধান-বিশারদ কাশ্যপ (S. C. Kashyap)-এর অভিমত অনুযায়ী সাধারণতন্ত্র হল এক বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী এখানে থাকে না। সকল নাগরিকের জন্য সকল সরকারী কর্মদপ্তর খোলা থাকে। এ ক্ষেত্রে সরকার কোন রকম বাছবিচার করে না। সাধারণতন্ত্রে কোন বংশানুক্রমিক শাসক থাকে না। এখানে জনগণ রাষ্ট্র-প্রধানকে নির্বাচিত করে। তাঁর কার্যকাল নির্দিষ্ট। রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণত রাষ্ট্রপতি বলা হয়।

সাধারণতন্ত্র

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির পদ নির্বাচনমূলক। তিনি ৫ বছরের জন্য জনগণের দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তা ছাড়া এখানে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এখানে জনগণের হাতেই ন্যস্ত আছে। এখানে সকল রকম শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা ও বৈষম্যকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এইভাবে আদর্শগত অর্থেও ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. D. Basu) বলেছেন : "The peamble to our constitution uses the term in both senses."

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, অ-সাধারণতান্ত্রিক গণতন্ত্রে (Non-Republican Democracy) রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হল উত্তরাধিকারমূলক বা বংশানুক্রমিক। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাজা বা রানী। তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাসীন হন। নিউজিল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন গভর্নর-জেনারেল। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত করেন গ্রেট ব্রিটেনের রাজা বা রানী। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হল সাধারণতান্ত্রিক। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি নির্বাচিত হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ভারত-ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের সদস্যপদ বজায় রেখেছে। এই সংস্থার প্রধান হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীকে মান্য করা হয়। এতেই অনেকের আপত্তি। এঁদের মতানুসারে কমনওয়েল্থের সদস্যপদ ভারতের সাধারণতন্ত্রী চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু এই অভিযোগ ঠিক নয়। কমনওয়েল্থের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিতান্তই স্বেচ্ছামূলক। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু উল্লেখ করা দরকার যে কমনওয়েল্থের ধারণারও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রও এখনও স্বচ্ছন্দে এই সংস্থার সদস্য হতে পারে। এই সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য বা সদস্য থাকার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীর কাছে আনুগত্য দেখাতে হয় না। সংবিধান বিশেষজ্ঞ বি. এন. রাউ (B. N. Rau) বলেছেন : "The conception of the Commonwealth has been steadily growing and has now reached a stage when even states with a republican constitution may well be given a place therein."

কমনওয়েল্থের সদস্যপদ সাধারণতন্ত্রী প্রকৃতির পরিপন্থী নয়

(গ) প্রস্তাবনায় নাগরিকদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যায়বিচারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "Justice means harmonisation of interests between the individuals, between groups, and between the individuals and groups on the one hand and interests of the community on the other.....Justice is defined or elaborated as social, economic and political, again giving precedence to social and economic over political justice." এই ন্যায় বিচারের লক্ষ্য সংবিধানের ৩৮ ধারায় ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া, সামাজিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার বিলোপ (১৭ ধারা) ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা (৩৩০-৩৪২ধারা) ; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান কাজের জন্য সমান ও যথাযথ মজুরী এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি (৩২৬ ধারা) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ন্যায়বিচার

(ঘ) প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এখানে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় অর্থেই স্বাধীনতা শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নাগরিক জীবনের উপর থেকে যে-কোন রকমের নিয়ন্ত্রণের অবসান। ইতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশের সংরক্ষণকে বোঝায়। প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা শব্দটি মূলতঃ দ্বিতীয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) বলেছেন : "Our Constitution recognises liberty in its positive and comprehensive aspects." এই উদ্দেশ্যে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য স্বাধীন বিচার-বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯-২২ ধারায় স্বাধীনতার অধিকার এবং ২৫-২৮ ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সংবিধানে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া যথার্থ স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে না।

স্বাধীনতা

(ঙ) প্রস্তাবনায় মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতার প্রস্তাব করা হয়েছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য এ কথা বলা হয়েছে। সাম্য ছাড়া গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্থহীন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতানুসারে সমাজে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকলে জনগণের স্বাধীনতার অস্তিত্ব অসম্ভব। অধ্যাপক জোহারী বলেছেন : "Liberty is a sham without equality." সংবিধানে সকল ক্ষেত্রে সবরকম কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ ও উপাধির বিলোপ এবং সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ১৪-১৮ ধারার মধ্যে সাম্যের নীতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে সাম্যের অধিকার প্রচলিত আইন ও সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা কার্যকর সমতা বজায় রাখার মত সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সাম্য

(চ) প্রস্তাবনার শেষে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য সকল নাগরিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ড. আম্বেদকরের অভিমত অনুযায়ী ভারতীয়দের মধ্যে সহমর্মিতা, আমরা এক জাতি, এক প্রাণ—এই বোধই হল সৌভ্রাতৃত্ব। এই নীতির মাধ্যমে সমাজে ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয়। ড. আম্বেদকর বলেছেন : "Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians— of Indians being one people. It is the principle which gives unity and solidarity to social life." আশা করা হয় যে, ভ্রাতৃতবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

সম্ভব হবে। সংবিধানকাররা ব্যক্তির মর্যাদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভবপর। এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছাড়া আর্থনীতিক উন্নতির উদ্যোগ সফল হতে পারে না। আবার দেশ ও দেশবাসীর স্বাধীনতা-মর্যাদা এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আবশ্যক। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে 'সংহতি' শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে। ভারতীয় মাত্রেই একই দেশমাতার সন্তান এই ধারণা সকলের মধ্যে জাগ্রত করাই এর উদ্দেশ্য। প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি সকল নাগরিকের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা অসম্ভব । অধ্যাপক জোহারী বলেছেন : ''The unity and integrity of the nation stands on the basis of the dignity of the individual. '' তবে ভারতের ঐক্য ও সংহতি সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির দাপটে বর্তমানে বিপদাপন্ন।

ভ্রাতৃত্ববোধ

ভারতের সংবিধানের মহান আদর্শ ও দর্শন প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। গ্রানভিল অস্টিন (G. Austin) যথার্থই বলেছেন যে, এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতানুসারে এর ফলে ভারতের পুনর্জন্ম সুনিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকার (P. B. Gajendragadkar) -এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে প্রস্তাবনা নিজে নিজেই যেমন ক্ষমতার উৎস নয়, তেমনি আদর্শ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত দর্শন ও আদর্শগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত সহায়ক আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। সংবিধান বিশারদ সুভাষ সি. কাশ্যপ (Subhash C. Kashyap) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার উপযোগিতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : ''.... an analysis of the various concepts and terms in the Preamble shows that the noble words of our Preamble represent the quintessence, the philosophy, the ideals or the soul of the entire Constitution of India.''

মূল্যায়ন